# ভারতের “সিভিয়ার প্লাস” দূষণ সমস্যার সমাধানঃ লাইসেন্স রাজ বনাম দূষণ নিয়ন্ত্রকের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের ব্যবহার

অনন্ত সুদর্শন

১৪ এপ্রিল, ২০২৫

বিয়ের অনুষ্ঠান আর পালাপার্বণের মতই, বায়ু দূষণও উত্তর ভারতের শীতকালের অবধারিত অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস জুড়ে ভারতের রাজধানী দিল্লির পার্টিকুলেট (অতিক্ষুদ্র কঠিন ও তরল কণাযুক্ত) বায়ুদূষণ ২৫০ মিউজি/এমকিউব ছাড়িয়ে গেছিল। এই সংখ্যাটি এতটাই বেশি, যে এর সম্পর্কে প্রায় কোনও তথ্যই পাওয়া যায় না। যেখানে হু (ডাবলইউএইচও) নিরাপদ বায়ু ৫ মিউজি/এমকিউব বলে ধার্য করেছে, সেখানে ভারতের বায়ুর মান শুরুই হয় ৪০ মিউজি/এমকিউব থেকে। নিয়ন্ত্রকরা বায়ুর গুণমান বোঝাতে বিশেষণ ব্যবহার করেন, কিন্তু এই গুণমানের হাল বর্তমানে এতটাই মন্দ যে, ভারত সরকারকে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্সকে বাড়াতে হচ্ছে। আগে এই ইনডেক্সের উচ্চতম মাত্রাটিকে “সিভিয়ার” বলা হত, এখন তারও উপরে “সিভিয়ার প্লাস” নামের একটি মাত্রাকে জুড়তে হয়েছে। এই স্তরের দূষণকে বর্ণনা করার জন্য আমাদের হাতে আর প্রায় কোনও বিশেষণই বাকি নেই।

ভারতের তথাকথিত “দূষণ ঋতু” অনেকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করে থাকে, কিন্তু আদতে এই সমস্যাটি কয়েকটি মাত্র শহর ও শীতের মাসগুলিতেই সীমাবদ্ধ নয়। গত দুই দশক ধরে এই দেশের দূষণ অবিচলিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১ সালে কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ভারতের দূষণের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫১ মিউজি/এমকিউব, যা হু-এর বায়ুর আদর্শ নিরাপদ মানের প্রায় দশ গুণ বেশি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা হিসেব করে দেখেছেন যে, ভারতে জীবনের প্রত্যাশার উপর প্রথম ও প্রধান যে বিপদটি ঘনিয়ে এসেছে, তা হল বায়ু দূষণ। এর ফলে, এই দেশের জীবনের ব্যাপ্তি এখন হু-এর কাঙ্খিত লক্ষ্যের তুলনায় ৩.৬ বছর কম। এই পর্যবেক্ষণগুলি থেকে কয়েকটি অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন উঠে আসেঃ অবস্থা এত খারাপ কেন? কেন কোনও রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না? এইসমস্যার সমাধানের জন্য ভারত কি ধরণের বাস্তব নীতি তৈরির পদক্ষেপ নিতে পারে?

তবে, সমাধান পাওয়ার আগে এমন একটি কাল্পনিক অপচ্ছায়াকে নিয়ে আলোচনা করতে হবে, যে উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিবেশকেন্দ্রিক পদক্ষেপগুলিকে চলনশক্তিহীন করে দিতে পারে। এই অপচ্ছায়াটি হল একটি ধারণা, যা অনুযায়ী, কোনও দেশ যত ধনী হয়ে উঠবে, স্বাভাবিকভাবে, ততই দূষণ মুক্ত হবে। এই ধারণাটিকে – অনেক সময়ই যাকে কুজনেট কার্ভ বলা হয় – সমর্থন করে এমন কোনও তথ্য খুবই সীমিত। দুর্ভাগ্যক্রমে, দূষণের একটিমাত্র উৎস আছে, যা দারিদ্র দূরীকরণ ও বায়ুর নির্মলতার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা যায়ঃ হিসেব মত ভারতের দূষণের প্রায় ৩০ শতাংশ কৃষিজাত বর্জ পদার্থকে গৃহের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার ফলে সৃষ্ট। অন্যান্য উৎস, যেমন গাড়ি, নির্মাণ ও

কলকারখানা থেকে নিঃসরণ ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়বে বলেই ধরে নেওয়া যায়। তাই, প্রশ্ন করা প্রয়োজন নির্মল বায়ু ও জাতীয় আয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি কুজনেট কার্ভ অনুমানটির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে না? অর্থাৎ, দারিদ্রের ফলেই দূষণের সৃষ্টি নয়, বরং দূষণ মুক্তি ফলে দারিদ্রের উপশম আরও দ্রুত হবে।

**কাগজের আইন**

বায়ুর গুণমান যে দ্রুত খারাপ হচ্ছে, তা দূষণের উৎসগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি পরিকাঠামোগত ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রণীত আইনেটি হল এয়ার (প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ পলিউশন) অ্যাক্ট অফ ১৯৮১। এই আইনের সমর্থন পেয়ে, ভারতের দূষণ নিয়ন্ত্রকরা বহু বছর ধরে অনেক নিয়ম ও আদর্শের প্রণয়ন করেছেন। এগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই একটি আদেশ-এবং-নিয়ন্ত্রণের কাঠামোকে অনুসরণ করে। একজন নিয়ন্ত্রক দূষণের সীমা নির্ধারণ করেন, বা একটি প্রযুক্তি বা প্রক্রিয়া ব্যবহারের আদেশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারখানা বন্ধ বা এমনকি কারাদণ্ডের মত অপরাধমূলক জরিমানাও ধার্য করার ভীতি প্রদর্শনও করা হয়, যাতে এই আইনগুলিকে প্রয়োগের কাজটি আরও জোর পায়।

উপরে উপরে দেখলে, এই পদক্ষেপটি শুনতে ভাল। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাস্তবে অবস্থাটি বেশ হতাশাজনক। এই আইনগুলির অনুনবর্তিতা নিয়ে অনেক বিবরণী-মূলক বিবৃতি ও তথ্য পাওয়া যায়। গুজরাটে পরিচালিত একটি গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, ৬০ শতাংশের বেশি ক্ষুদ্র শিল্প দূষণের নির্ধারিত সীমা পেরিয়ে গেছে, এবং নিয়ন্ত্রকরা শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাছাবাছি করেছেন, এমনকি দূষণ পরীক্ষায় ব্যর্থতাকাও বিবেচনা করা হয় নি। কাগজে লেখা আইন ও তা বাস্তবে চর্চার মধ্যে এই জাতীয় পার্থক্য কেবল কলকারখানার নিঃসরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। একটি সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড সংস্থা দিল্লির গাড়ির দূষণ পরীক্ষা কেন্দ্রের পরীক্ষা করার পর জানায়, "পিইউসি [পলিউশন আন্ডার কন্ট্রোল] পরীক্ষাগুলি যেভাবে পরিচালিত হয়, এবং সমস্ত এনআরসি [ন্যাশনাল ক্যাপিটাল সেন্টার] জুড়ে অসংখ্য পিইউসি কেন্দ্রতে যেভাবে যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ হয়, তার গুণমান গভীর উদ্বেগের কারণ। দুর্নীতির ছাপ এখানে স্পষ্ট ও লক্ষণীয়।"

এই নিয়মগুলো যে প্রায় কাজই করছে না, তার কারণ সরকার কী করতে চায় আর তার কতটা প্রয়োগ করতে পারে তার মধ্যে তফাত। যখন একজন পরিবেশ নিয়ন্ত্রকের হাতে যখন অসংখ্য কলকারখানার দূষণের সীমা মানে না চলার দৃষ্টান্ত আসে, তখন তাঁর পক্ষে, সেগুলিকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করার শত শত বিজ্ঞপ্তি জারি করা ও তার ফলে আদালতে মামলা শুরু হলে, তা চালিয়ে যাওয়া, রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল বেছে বেছে শাস্তি দেওয়া, যা যে কোনও নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়া নিয়ে সতর্ক থাকার পূর্বাভাস দেয়, এবং দুর্নীতির দরজা খুলে দেয়। মানব সম্পদও এক্ষেত্রে একটি ভূমিকা পালন করে। ভারতের দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাগুলিতে অনুমোদিত কর্মচারীর অভাব, যে অবস্থা আবার অসংখ্য ফাঁকা পদ ও সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ কর্মীদের অনুপস্থিতির কারণে আরও খারাপ হয়ে উঠেছে এবং একেই ঘোষ ও অন্যান্যদের বিবৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

**বাজার-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ**

কারণ যাই হোক, নিয়মের নির্মাণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতার ব্যবহারের আশু প্রয়োজন আছে। একটি বিকল্প হতে পারে দুষণ শুল্ক বা ক্যাপ অ্যান্ড ট্রেড বাজারের মত বাজার-ভিত্তিক পরিবেশকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণের উপায় ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করা। বর্তমানে, একটি টপ-ডাউন বা উপর থেকে নিচে প্রবাহিত প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিটি কারখানার জন্য একটি লক্ষ্য স্থির করার হয়, এবং এই লক্ষ্যের উপযুক্ত প্রয়োগ না হলে যথোচিত শাস্তির দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়াটির বদলে একটি নমনীয়তর পদ্ধতি চালু করাই দ্বিতীয় বিকল্পটি ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য। ক্যাপ-অ্যান্ড-ট্রেড পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রকই স্থির করেন মোট কতটা দূষণ গ্রহণযোগ্য, এবং সেই স্তরকেই সীমা হিসেবে নির্ধারণ করেন। একবার এই সীমা প্রতিষ্ঠিত হলে, দূষণ কমানর কাজটিকে শিল্পগুলি নিজেদের মধ্যে হিসেব মত ভাগ করে নেওয়ার জন্য, পরস্পরের মধ্যে অনুমতিপত্রের কেনাবেচা করতে পারে।

এই কৌশলটি ব্যবহার করলে কিছু সংস্থার খরচ অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে হয়। যেমন, একটি ছোট শিল্প যদি দূষণ কমানর মূল্যবান সরঞ্জাম কিনতে অপারগ হয়, তবে ওই সংস্থা একটি বৃহৎ শিল্পকে টাকা দিতে পারে, যাতে বড় শিল্পটি তাদের দিক থেকে খানিকটা দূষণের সীমা নামাতে পারে। পরিবেশগত দিক থেকে দিক থেকে দেখলে, কে দূষণ কমানর কাজে বেশি দায়িত্ব নিয়েছে, তা জরুরি নয়। এ ক্ষেত্রে বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল যে, আগে ওই ছোট শিল্পটি নিয়ম লঙ্ঘন করার চেষ্টা করত আর এখন, এই উপায়টি অনুসরণ করার ফলে, তার কাছে নিয়ম মেনে চলার একটি সাশ্রয়ী পন্থা আছে। খরচের কথা বাদ দিলেও, কারখানা বন্ধ করে দেওয়া বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মত কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার বদলে, অর্থদণ্ড হলে, বাজারের সাহয্যে দূষণসংক্রান্ত আইন ও নিয়মের প্রয়োগ আরও সহজ হয়ে উঠতে পারে। এছাড়াও উল্লেখ করা উচিত যে, কর্মচারীদের হাতে করা হিসেবের বদলে, বাজার সাধারণত প্রযুক্তির সাহায্যে নিঃসরণের উপর চোখ রাখে।

বাজারের ধারণা উন্নত দেশগুলিতে, এমনকি চিনেও কোনও নতুন ধারণা নয়। ১৯৯০ ক্লিন এয়ার অ্যাক্ট সংশোধনী আইনটির প্রবর্তনের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। সালফার ডাইঅক্সাইড নিয়ে কেনাবেচার খ্যাতনামা বাজারগুলি এই আইন ব্যবহারের প্রথমদিককার উদাহরণ। সালফার ডাইঅক্সাইড নিয়ন্ত্রণের জন্য চিন ২০০৭ সালে অনুমতিপত্র কেনাবেচার পদ্ধতি অনুসরণ করা শুরু করার পর ২০১৯ সাল নাগাদ প্রতি বছর ৩৮ মিলিয়ন টোন নিঃসরণ কমে ১২ মিলিয়নে এসে দাঁড়ায়। ফাউলি, হল্যান্ড ও মনসুরের গবেষণা অনুযায়ী, ইউএস রিক্লেম বাজারগুলি যে নাইট্রোজেন অক্সাইডকে নিশানা করছে, এর ফলে নিঃসরণও পাঁচভাগ কমে যাবে। এই আশাপ্রদ উদাহরণগুলি সামনে থাকা সত্ত্বেও, এমনকি ২০২৪ সালেও, একটিমাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া, ভারতে বাজারের উপস্থিতি প্রায় শূন্য।

২০১৯ সালে, সুরাটে ভারতের প্রথম নিঃসরণ বাজার চালু করার জন্য, গুজরাট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এই প্রবন্ধের লেখকসহ কয়েকজন গবেষকের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার সময় যদৃচ্ছভাবে বেছে নেওয়া একটি নিয়ন্ত্রণের পরীক্ষামূলক নকশা যুক্ত করা হয় এবং এটি প্রথম নিঃসরণ বাজার যাকে এত কঠোরভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে আমরা দেখিয়েছি যে, নিয়ন্ত্রিত কারখানার মাধ্যমে, বাজার পার্টিকুলেট নিঃসরণের মাত্রা ২০-৩০ শতাংশ কমাতে সক্ষম হয়েছে। তার জন্য যে অনেক খরচ হয়েছে,

এমনও নয়। তার বদলে, অনুমতিপত্র কেনাবেচা সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কেনাবেচার বাজার দূষণ দমনের খরচ, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার তুলনায় বরং ১১ শতাংশ কমে গেছে। আমরা হিসেব করে দেখি যে, বেনিফিট-টু-কস্ট অনুপাত, কোন দূষকের হ্রাসের ফলে আয়ু দীর্ঘ হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে, দ্বিতীয়টির আনুমানিক আর্থিক মূল্যের উপর ভিত্তি করে, মোটামুটি ২৫:১ থেকে ২০০:১-এর বেশি।

**সহজে ব্যবহারযোগ্য একটি পন্থা**

এই পরীক্ষামূলক প্রকল্পের পর, গুজরাট সরকার রাজ্যের অন্যান্য অংশেও এই রকম বাজারের সংখ্যা বাড়ানর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন এবং আরও সম্প্রতি, মহারাষ্ট্রও সালফার ডাইঅক্সাইড নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নতুন ক্যাপ-ও-ট্রেড প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। দেখার বিষয় হল, এই উপাদানগুলি বৃহত্তর ক্ষেত্রে ও ভারতের অন্যান্য অংশে কি ভাবে কাজ করে, তবে শুরুর জন্য এই প্রথম পদক্ষেপ অনেকটাই আশাপ্রদ।

যদিও, ক্যাপ-ও-ট্রেড প্রকল্পগুলি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা হয়, বাজার-ভিত্তিক পদক্ষেপগুলি অন্য জায়গাতেও ব্যবহার করা যায়। গত বছর, গাড়ির কারণে ঘটা বায়ু দূষণকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দিল্লি সরকার গাড়ির বাহুল্যকে কেন্দ্র করে একটি নতুন মুল্যকেন্দ্রিক ব্যবস্থা চালু করার কথা ঘোষণা করেছেন। যদি এই পদক্ষেপগুলি বাস্তবায়িত হয়, তবে অবশেষে এমন একটি সহজ পন্থা পাওয়া গেছে, যার সাহায্যে, রাস্তায় চলমান গাড়ির সংখ্যা প্রয়োজন মত বাড়ান বা কমান যায়, বিশেষ করে অতিদূষণপ্রবণ মাসগুলিতে। এরপর, জয়চন্দ্রন ও অন্যান্যরা শর্তসাপেক্ষ মূল্যদানের একটি ধারা জুড়ে একটি সুচিন্তিতভাবে নকশা করা চুক্তিপত্র ব্যবহার করে কী ভাবে কৃষিজাত জঞ্জাল কম পরিমাণে পোড়াতে কৃষকদের অনুপ্রাণিত করা যায়, তা দেখিয়েছেন। এই পোড়া কৃষিজাত জঞ্জাল থেকে নিসৃত ধোঁয়াই ভারতের রাজধানীর দূষণের একটি প্রধান উৎস।

ভারতের দূষণজনিত সমস্যাটি গভীর ও ক্রমবর্ধমান। এর ব্যাখ্যা অংশত কাগজে লেখা আইন ও তার মধ্যে কোনগুলিকে রাষ্ট্রের দ্বারা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব, তার মধ্যেকার তফাৎ বলে মনে হয়। নিয়মের ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের ব্যবহার, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নতুন উদ্ভাবনের মতই গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাটের উদাহরণ থেকেই বোঝা যায় যে, নতুন পন্থা ব্যবহারের ফলাফল লাভজনক হতে পারে। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে, পরিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়ে "লাইসেন্স রাজ" রীতির বাইরে বেরিয়ে ভারত যদি নতুন কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবে, তবে তা দেশের ভবিষ্যতের জন্য ভালই হবে।

*অনন্ত সুদর্শন ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।*